কবিতার অন্দরমহল

রমেন আচার্য

নাটকে বা কথাসাহিত্যে একটি চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রিত করতে কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু যদি দেখি, নাট্যমঞ্চে এক তরুণের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে— 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা' তাহলে মুহূর্তেই তাকে শিক্ষিত, সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ হিসেবে আমরা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করবো না। সত্যি কি তাই? তাহলে কি শিক্ষিতসমাজের কাছে জীবনানন্দ প্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতায় পথরোধ করা দুর্ভেদ্য দেয়াল আর নেই?

ছাত্রজীবনে বাধ্য হয়ে কবিতা পড়তে হয়েছিল, তখন শিক্ষকদের আলোচনা ও বিশ্লেষণে কবিতার অমৃতভান্ডটি তো শুধু উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে চাকরি, সংসার ইত্যাদির মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে কবিতাবিচ্ছিন্ন হয়েছি অনেকেই। সন্তানের আবৃত্তির প্রয়োজনে লাগবে, তাই খোঁজ পড়েছিল কবিতার। ব্যাস, তার পরে আমাদের সিরিয়ালসমৃদ্ধ সুখী গৃহকোণে এসে কাব্য জগতের কোনো তরঙ্গই বিঘ্ন ঘটায়নি। যে অভাববোধ থেকে কবিতার তৃষ্ণা জন্মাতে পারে, তা কি ভিন্ন বিনোদন এসে ভুলিয়ে গিয়েছে?

লেখাটি শুরু হয়েছে যে শিক্ষিত কবিতাপ্রেমিক যুবকটির মুখে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' নামক কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে, সেই জীবনানন্দকে আমরা কতটা চিনেছি? বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় বহুবার জীবনানন্দকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, কবি হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা ও উচ্চতা বিশ্লেষণ করেছেন। না হলে তো আরও বেশি দেরি হয়ে যেতো তাঁকে জানতে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর উচ্চতা বুঝেছি আমাদের নিজের বোধে, নিজেই কবিকে আবিষ্কার করে, নাকি লোকমুখে ও নানা আলোচনা শুনে একটা ধারণা হয়েছে মাত্র? এটা কিন্তু খুব জরুরী প্রশ্ন। মঞ্চের ওই যুবকের সামনে যদি তার প্রেমিকা এসে সরল ভাবে জানতে চায়— "আচ্ছা, 'হিজলের জানালা' কেমন, আর বুলবুলি খেলছে তা বুঝলাম, কিন্তু স্থির ও অনড় আলো কী ভাবে খেলছে চঞ্চল বুলবুলির সঙ্গে?" ওই বিড়ম্বিত যুবক বা আমরা কি তখন বলবো— কবিরা অনেক আবোল তাবোল কথা কবিতায় ঢুকিয়ে দেন, যা না বুঝলেও ক্ষতি নেই। সত্যিই কি কোনো ক্ষতি হয় না, কবিতার কিছু কিছু কথা না বুঝলে?

এমন কিছু পাঠক আছেন, আবৃত্তির অনুষ্ঠানে এসে যাঁদের কবিতার প্রতি আকর্ষণ ও

ভালোবাসা জন্মেছে, অথচ কোনো বিখ্যাত কবির কাব্যগ্রন্থ কিনে পড়তে গিয়ে তিনি হয়তো দেখছেন— কবিতার গভীরে যাওয়ার পথ যেন ভিতর থেকে বন্ধ, খোলা যাচ্ছে না। কেন এমন হয়? কারণ কবিতার জগতে দুটি ভিন্ন ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আবৃত্তিমঞ্চের মতো শ্রোতা ও পাঠকের দ্বারা অভিনন্দিত কবিতার একটি ধারা। অভিনন্দিত কেন? কারণ আবৃত্তিকার এমন কবিতা নির্বাচন করেন যা শোনা মাত্রই শ্রোতাদের আলোড়িত করবে। অনেক সময় কাহিনিযুক্ত, আবেগপ্রবণ, নাটকীয় ও মঞ্চসফল কবিতা সহজেই বোধগম্য হয় বলেই তা শ্রোতাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। অন্য একটি ধারা জটিল, গভীর ও সূক্ষ্ম কবিতার, যা শোনার নয়, বার বার পাঠ করলেই না-বোঝা কুয়াশা সরে যেতে থাকে। এরকম কবিতায় কবি চান কবিতার মধ্যে অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত, রহস্যময়তা ও কবিতার নিজস্ব শিল্পকলা যুক্ত করে কবিতায় বচনাতীত অনুভবকে প্রকাশ করতে। ফলে তা গভীর ও কিছুটা জটিল। সে রকম কবিতার পাঠক সর্বদেশে ও সর্বকালে খুবই সামান্য। এরকম হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক কেন? কারণ খুব অল্প সংখ্যক মানুষ যাঁরা কবিতা পড়েন, তাঁদের অধিকাংশই ছন্দ-মিলের রম্যতায় এমন মুগ্ধ ও তৃপ্ত যে তাঁরা ওই মুগ্ধ বেষ্টনীর বাইরে এসে কবিতার অন্য সম্পদ আবিষ্কারের কথা ভাবেন না। একমাত্র ছন্দ-মিল যুক্ত রচনাই তাঁদের কাছে কবিতা বলে সমাদৃত। ফলে কী হয়? ভালো কবিতার ভিতরে যে সব সম্পদ থাকে, তাকে খোঁজার তাগিদ না থাকায় সেই সম্পদ অবহেলিত হয়, আর তাতে খুব বড় ক্ষতি হয়ে যায় কবিতা-জগতের।

আগে যে কবির ছন্দ-মিলের জাদু পাঠককে মুগ্ধ ও জনপ্রিয়তা দিয়েছে, সেই কবি অনেক সময় ছন্দহীনতাকে কেন বেছে নেন, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? কী কারণে তিনি পাঠকের প্রিয় ছন্দ-মিলের পথ থেকে সরে এলেন? তাঁর কি জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় নেই। তাহলে কি তিনি অন্য ভাবে কবিতাকে আবিষ্কার করেছেন? 'ছন্দোবদ্ধ সজ্জা'-কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবিতার 'বহিরাবরণ', তা কবিতার বাইরের দিক, ভিতরের সম্পদ নয়। কবিতার গহন গভীরে যে সম্পদ, সেখানেই কবিতার অমৃতভান্ড— কাব্যরস। এই কাব্যরস ছন্দ-মিলে, অথবা কবিতার প্রয়োজনে ছন্দ-মিল ছাড়াও রচিত হতে পারে। দেখতে হয়— কবিতার বাহন হিসেবে কোন পদ্ধতি সঠিক হবে। ফলে কবি সচেতন ভাবেই তা নির্বাচন করে থাকেন।

বুদ্ধদেব বসুর একটা কথা (তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলেছিলেন) এক্ষেত্রে জরুরী ভেবে তুলে দিলাম—

'... অনেকে বর্ণান্ধ হয়ে জন্মায়, তেমনি অনেকে জন্মায় কবিতাবধির হয়ে— দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা বেশি। কবি বারবার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাশক্তি থাকতেই হবে পাঠকের। তারপর শিক্ষা, চর্চা ও সংস্কৃতির ফলে উপভোগের ক্ষমতা ক্রমশই ব্যাপক ও গভীর করে তোলা যায়, একথা বলাই বাহুল্য।'

'সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক'— বলেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথাটা কবিতার ক্ষেত্রে সঠিক। কারণ পাঠ করার পরে যদি মন তার নির্যাস গ্রহণ না করতে পারে,

তাহলে তো তা শুধুমাত্র উচ্চারিত হয়েছে, এটুকুই বলা চলে। কবিতার মধ্যে কবির অনেক না-বলা কথা থাকে, সংকেত থাকে, কবিতা-পাঠককে তা নিজের বোধে ও কল্পনায় সৃজন করতে হয়। তাহলেই পাঠক সংবেদী পাঠক হয়ে ওঠেন। কবিতার পাঠককে সৃজনশীল হতেই হয়। বুদ্ধদেব বসু সেই কারণেই বলেছেন— 'কবি বারবার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাশক্তি থাকতেই হবে পাঠকের।' কল্পনার শক্তিতেই পাঠকও সৃজনশীল হয়ে ওঠেন।

আমার কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধের বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা— 'সৃজনশীল পাঠককে'। লেখক সৃজনশীল, সকলে একথা জানেন, কিন্তু পাঠক সৃজনশীল— এ কথা বললে অনেকে তা মানেন না। মনে হবে পাঠককে সৃজনশীল বললে তাকেও যেন লেখক-শিল্পীর উচ্চতায় তুলে আনা হল। কবিতার প্রসঙ্গে এনে বিষয়টি একবার ভেবে দেখা যাক।

কবিতার সামনে দাঁড়ালে কবিতার যে শব্দগুলিকে বোবা ও নিঃসাড় মনে হয়, তাই সবাক হয়ে ওঠে সংবেদী পাঠকের বোধের আলোয়। যে কবিতার অর্থ একসময় শুধু জানতেন 'কবি ও ঈশ্বর', এখন তার অর্থ কি পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে? না, কবির হাতে সৃজন ঘটেছিল যে কবিতার, তার নবজন্ম হতে থাকে পাঠকের নতুন নতুন সৃজনে। অংকের মতো একই উত্তর হয় না কবিতার। কবিতার প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও বহুবর্ণ কল্পনায় তা তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। কবির মুখ থেকে কবিতার ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষায় পাঠক বসে থাকেন না। নিজের কল্পনায় কবিতার গভীরে ভ্রমণের সুখ দেয় যে কবিতা, তা পাঠককে বেশি আকর্ষণ করে। এই সৃজনসুখ ও তার প্রায় অলৌকিক তৃপ্তি পাঠককে এক অপরিসীম আনন্দ দেয়। তাই হয়তো খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেও কোনো কোনো কথাসাহিত্যিক বলেন, কবিতাই তার প্রিয় বিষয়। সংবেদী পাঠকের কল্পনা ও সৃজনশীলতাই কবিতার বন্ধ দরজা খুলে দেয়।

কবিতা শুধুমাত্র বিষয় বা বক্তব্যের শক্তিতেই ভালো কবিতা হয়ে ওঠে না। কবিতার ভান্ডারে যে সব সম্পদ থাকে, তা কবির নির্মাণে যুক্ত হয়ে কবিতাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। শব্দ, উপমা, ব্যঞ্জনা, কল্পনা, চিত্রকল্প, চিত্ররূপময়তা, অনুভবচিত্র ইত্যাদি গুণপনা যেন শিল্পীর প্যালেটে নানা রঙ, প্রয়োজন মতো যা দিয়ে অধরা মাধুরীকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়। সম্ভবত কবিতা তা পারে, পারে বলেই এখনো কবিতা সূক্ষ্মতম শিল্পমাধ্যম। কবিতার সম্পদ ও তার শিল্পকলাকে জানলে 'ভালোলাগা কবিতা' ও 'ভালো কবিতা'-র পার্থক্য স্পষ্ট হতে পারে।

তাহলে কবিতার সম্পদ বলবো কাকে? আমরা যদি ভাবি যে কবিতার সব চাইতে বড় সাফল্য হলো— যা বচনাতীত বা অধরা অনুভব, তাকে কবিতায় প্রকাশ করার সক্ষমতা, তাহলে দেখবো 'শিল্পীর প্যালেটে নানা রঙ'-এর মতো— শব্দ, উপমা, ব্যঞ্জনা, কল্পনা, চিত্রকল্প, চিত্ররূপময়তা, অনুভবচিত্র ইত্যাদি গুণপনা, যা কবির নির্মাণশিল্পের সহায়ক হয়ে ওঠে, তাই হয় কবিতার সম্পদ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কবির উদ্ভাবিত নিজস্ব সম্পদও। রবীন্দ্রনাথের ,কটি মূল্যবান কথা এক্ষেত্রে মনে রাখা খুব জরুরী, তা হলো— 'বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটি দিক আছে সে তার শিল্পকলা।' হয়তো ভাব বা

বিষয়, তৎসহ ছন্দ-মিলের গুণে কবিতাটি পাঠক বা শ্রোতার মুগ্ধতা অর্জন করেছে, আবেগে চোখ অশ্রুসজল করেছে, তাহলেও তা কাব্যবিচারে কবিতা না-ও হতে পারে, যদি তাতে কবিতার যে আর-একটা জরুরী দিক— যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিল্পকলা', তা কবিতায় উপেক্ষিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জরুরী ও মূল্যবান এই কথাটা কবিকে মনে রাখতেই হয়।

কবিতার যে শিল্পকলার কথা বলা হয়, সেটা কী? বাজারের ফর্দের মতো কি এমন কোনো তালিকা আছে, যা থেকে এক একটা 'শিল্প' তুলে এনে কবিতায় যুক্ত করা যায়, আর তাতেই সাফল্য আসে? আমরা একবার মুখ তুলে তাকাতে পারি অন্য সব শিল্পমাধ্যমের দিকে। চলচ্চিত্র, নাটক বা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুধুমাত্র বিষয় গৌরবে তার উচ্চতা নির্ধারিত হয় না। খুব বিখ্যাত কোনো গল্প বা উপন্যাস চলচ্চিত্র বা নাটকে পরিবেশিত হলে তা যে ওই মুল বিষয়ের উচ্চতার কারণেই নাটক বা চলচ্চিত্রেও সফল হবে, তা কিন্তু নয়। তার কারণ প্রতিটি মাধ্যমেরই নিজস্ব ভাষা, আঙ্গিক ও শিল্পকলা ভিন্ন, তার সাফল্য ও উচ্চতা বিচারেই ওই বিষয়ের উচ্চতা নির্ধারিত হয়। সৃস্টিকর্তার নিজস্ব বোধ থেকেও তার নিজস্ব কোনো পদ্ধতির প্রয়োগে বা সৃজনে তা ওই বিষয়ের শিল্পকলা হয়ে উঠতে পারে। কবিতার ক্ষেত্রেও তাই— 'কবিতার যে সম্পদগুলিকে আমরা জানি, তার সঙ্গে কবির নিজস্ব সৃজন যুক্ত হয়ে কবিতার শিল্পকলা হয়ে ওঠে। কবিতার এই সূক্ষ্ম ও সেই সঙ্গে জটিল বিষয়টি নিয়ে কবিকে ভাবতে হয়। এর প্রয়োগ-সাফল্য ও যোগ্যতা অর্জন একমাত্র আন্তরিক সাধনার ফলেই সম্ভব।

এবার ভাবা যেতে পারে কবিতার সম্পদ নিয়ে। যেমন 'শব্দ' কেন কবিতার সম্পদ বলে মনে করা হবে? কেউ বলতেই পারেন যে গদ্যেও তো সেই শব্দেরই ব্যবহার, তাহলে তা কবিতা নয় কেন? ভালো গদ্যও কথাশিল্প হিসেবে আদৃত, কিন্তু কবিতায় শব্দের কাজ এমন, যাতে ছোট কয়েক পঙ্‌ক্তিতে শব্দের ভিতরে কবি গুঁজে দেন এমন অদ্ভুত কোনো বিস্ফোরক যা প্রসারিত ও বিস্তৃত হলে গদ্যের নির্মাণে কয়েক পৃষ্ঠার বক্তব্য বা অনুভব হয়ে ওঠে। ফলে কেউ কেউ শব্দকে কবিতার সম্রাট বলে ভাবেন, তার ক্ষেত্রে যেন অযত্ন অবহেলা চলে না। জীবনানন্দের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি এখন প্রকাশ্যে এসেছে। ফলে স্পষ্ট হয়েছে যে জীবনানন্দও কেমন দ্বিধাগ্রস্ত ও যত্নবান ছিলেন কবিতার শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

বহু পাঠকই গভীর ও জটিল কবিতার উপরের স্তরের সহজ প্রাপ্তিকেই কবিতার সামগ্রিক প্রাপ্তি ভেবে খুশি থাকেন, কিন্তু বহুস্তরযুক্ত কবিতার সম্পদসন্ধানের তৃষ্ণা থাকে ক'জন পাঠকের? সৃজনশীল পাঠক কিন্তু কবিতার কোনো শব্দকেই উপেক্ষা করেন না। কারণ তিনি জানেন শব্দ নির্বাচনে কবিকে কি রকম ঘর্মাক্ত হতে হয়। রহস্যময় শব্দের ভিতরে কবির না-বলা গোপন কথার ব্যঞ্জনা খোঁজেন পাঠক। কবিতায় কবির নির্বাচিত শব্দ যেন আদতে শব্দবীজ। শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল নিয়ে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন গুটিয়ে থাকে উদ্ভিদের শক্ত বীজের ভিতরে, তেমনি শব্দের ভিতরও গুটিয়ে থাকে না-বলা কথা, যা ক্রমে পাঠকের ভাবনায় প্রসারিত হয়। পাঠকের মানসভূমিতে শব্দবীজ বপন করে কল্পনার জলসেচে তাকে প্রসারিত ও ফলবতী করে তুললেই কবিতার সোনার ফসল ঘরে তোলা সম্ভব।

আবার কবিতার সম্রাজ্ঞী বলে যদি কাউকে ভাবা হয়, তাহলে তা কল্পনা। কবিতায় এই উচ্চাসন তারই প্রাপ্য। কল্পনা হল যা নেই বা যা নয়, তারই সৃজন। অর্থাৎ মিথ্যে। সে জন্য কি তাকে বর্জন করা যায়? এই মিথ্যেই হলো কবিতার জাদুদণ্ড। অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বকেও পরাজিত ও তুচ্ছ করতে পারে যা, তা হলো কল্পনায় আঁকা পক্ষীরাজ ঘোড়া। মনে হয় এই মিথ্যের সৌন্দর্যের জন্যই রোবট-সভ্যতার মুখোমুখি হয়েও কবিতা জ্যোতির্ময় হয়ে থাকবে। কল্পনার সম্মোহন এমনই যে তা পাঠকের মনোজগতকে অতি সংবেদী করে তোলে, আর তখনই খসে পরে তার বিজ্ঞানমনস্কতা বা বাস্তবতার শৃঙ্খল। পাঠকের ভিতরেও যেন জেগে ওঠে সৃজনের তৃষ্ণা। সহসা পাঠকও দুটি ডানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিজের মধ্যে— কল্পনার ডানা, যা কবিতার সঙ্গী হয়ে কবিতাকে করে তোলে সর্বত্রগামী। অগম্য শৃঙ্গে কবিতার বিজয় পতাকা স্থাপন করে আসে কল্পনা। অনেক বিখ্যাত কবিতাই এই কল্পনার ঐশ্বর্যে সজ্জিত হয়ে ভাষাতীত অনুভবকে প্রকাশ করেছে যা অন্য ভাবে প্রকাশ করা যেতো না। 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী' থেকে কি বর্জিত হয়েছে কল্পনা? না, বরং মাটির বাণীকে তীক্ষ্ণ, অমোঘ ও শানিত করার প্রয়োজনে কল্পনাকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কবিতায়— এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে তাঁদের কাব্যভাণ্ডারে। যে পাথর প্রাণহীন, বোধহীন, বোবা— ভূমণ্ডলে আবদ্ধ ও অনড় হয়ে আছে যে বিশাল পর্বত, তার ইচ্ছে (?) আমাদের কাছে কল্পনার জাদুদণ্ডে সুন্দর ও বিশ্বাসযোগ্য করে কবি পৌঁছে দিয়েছেন এই ভাবে— 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। এরকম পঙ্‌ক্তি কল্পনার সম্পদেই মৃত্যুহীন।

কবিতার বিষয় যদি জটিল কোনো অনুভব হয়, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন তাহলে? কবি কি তখন পাঠকের কথা ভেবে পিছু হটে সেই বিষয় থেকে সরে গিয়ে সরল বিষয় নিয়ে ভাববেন, নাকি জেদ নিয়ে অধরা সেই মাধুরীকে ধরতে চাইবেন? সমস্যা এখানেই। সূক্ষ্ম কবিতার ক্ষেত্রে এই সমস্যা অনেক সময় পাঠক থেকে কবিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কবিতা তো নানা রকমের হয়, যে কবিতার সূক্ষ্ম বোধ— যা প্রায় স্নায়ুর আঁধারে অনুরণিত স্পন্দনের মতো— তাকে কবিতায় ধারণ করা কবির কাছে যেন একটা চ্যালেঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশ— এই দুই কবিকেও তো এই কারণেই অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁরা কী ভাবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কবিতার উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করতে চেয়েছেন, তা জানার চেষ্টা করলে পাঠকের সামনে খুলে যাবে এমন একটা পথ, যা তাঁকে কবির নির্মাণশিল্পের কাছে পৌঁছে দেবে। হয়তো তখন কবিতার এমন রহস্য উন্মোচিত হবে, যা কবিতার বাইরের চেহারায় সহসা বোঝা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলার পরেও অনেকে চিত্ররূপময়তাকে শুধু 'ছবি' ভেবে নিয়েছেন। কবিতায় বাস্তবধর্মী দৃশ্যাবলীর বর্ণনাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়নি, কথায় যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সেই অধরাকে প্রকাশের জন্যই শব্দ দিয়ে আঁকা ছবির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। একথা মনে না রাখলে 'ছবি' ও 'চিত্ররূপময়তা'-কে চিনতে ভুল হতে পারে। কিন্তু কোন অধরার ক্ষেত্রে ছবির কথা বলা হচ্ছে? যা বচনাতীত অনুভব, যা প্রকাশ করা যাচ্ছে না, তাকেই শব্দ দিয়ে আঁকার কথা

বলেছেন। কবিতায় এমন শব্দে আঁকা ছবিকেই বলা হয়েছে চিত্ররূপময়। 'বচনাতীত' যেন সোনার হরিণ— তাকে 'অধরা মাধুরী' বলাই সঠিক। শব্দটি কবিতার এমন এক উচ্চতম শৃঙ্গ, যাকে জয় করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও পাশাপাশি না পারার অক্ষমতা পীড়িত করে কবিকে। মনে হয় কবিতার এই অক্ষমতাকে কিছুটা অতিক্রম করা যায় 'চিত্ররূপমতা'-র সাধনায় ও প্রয়োগে সাফল্য এলে। তখন যেন কবির হাতে 'চিত্ররূপময়তা' জাদুদণ্ড হয়ে ওঠে।

'চিত্ররূপময়' বিষয়টিই যেন সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে আলোচনায় শব্দটি তো বার বার আলোচকের সামনে চলে আসার কথা। আসেনি, কারণ 'চিত্ররূপময়' শব্দটি নিয়েই তো আমরা ভাবিনি। অথবা বলা যায় যে, শব্দটিরই ভুল অর্থ জানি আমরা। অধরা মাধুরীকে ধরতে শব্দগুলি যখন তাকে চিত্রে রূপায়িত করছে, মনশ্চক্ষে তা 'চিত্ররূপময়' হয়ে ফুটে উঠছে বলে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' ও তৃপ্তি পাই আমরা। কবির কল্পনা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যেমন সক্রিয়, প্রায় সে রকমই সক্রিয়তা থাকে পাঠকেরও কবিতা পাঠের সময়, কবিতার রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে অথবা শব্দরচিত চিত্ররূপময় পঙ্‌ক্তি মনশ্চক্ষে দৃশ্যময় করে তোলার সময়। কল্পনার ডানা না থাকলে বিজ্ঞান ও বাস্তবতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ পাঠক কবিতার অসীম উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারেন না। 'চিত্ররূপময়' কবিতাও পাঠক দেখতে পান তাঁর কল্পনা ও সৃজনশীলতার শক্তিতে। এই চিত্ররূপময়তার এক সহোদরা, যা প্রায় যমজ সন্তানের মতো— আমরা 'অনুভবচিত্র' বলবো তাকে। শুধু সহোদরাই নয়, যেন যমজ সন্তান। কারণ তাদের প্রায় কোনো পার্থক্যই চোখে পড়ে না। কবিতায় ছবি ফুটিয়ে তোলাই দুজনের কাজ। প্রভেদ শুধু এই যে, একজন শব্দ দিয়ে আঁকে এমন ছবি যার আকৃতি আছে। যেমন 'চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' বললে ঢেউয়ের শরীরের বক্রতা মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে বলে তাকে বলা যায় 'চিত্ররূপময়' পঙ্‌ক্তি। আবার 'একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে' বললে, 'নিমেষ' বা মুহূর্তের শরীর নেই বলে শুধু মাত্র অনুভবেই তার আকৃতি কল্পনায় মনশ্চক্ষে ছবি হয়ে ভাসে, তাই তাকে বলি 'অনুভবচিত্র'। ফলে যে অনুভূতি হৃদয়ের গভীর স্তরের অন্ধকার থেকে শুধু স্পন্দিত হতো, যা ছিল বচনাতীত অনুভব, তা অনুভবচিত্রে প্রকাশ্যে আনা সম্ভব হল। 'অনুভবপ্রসূত' বিষয়গুলি মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনেই একান্ত জরুরী অনুভবে আঁকা চিত্রের। অনুভবে দেখি বলেই কথাগুলি ছবি হয়ে অর্থবহ হয়ে ওঠে। কবিতার এই স্বাদ যেন বিশাল এক প্রাপ্তি। পাঠক হিসেবে আমরা তখনই সফল যখন কবিতা পড়তে পড়তে মনের সঙ্গে চোখও তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে ছবি দেখার জন্য, যখন মনের দেহহীন অনুভব শব্দে আঁকা ছবি হয়ে ওঠে।

গল্প-উপন্যাসে যে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতার কথা নিয়ে খুব আলোচনা হয়, তা তো আসলে কবিতারই প্রাণ। কবিতায় ওই শিল্পকলা এসেছে বহু যুগ আগে। এখন গল্প-উপন্যাসে এই স্বাদ যুক্ত হয়ে অলৌকিক এক উত্তরণ ঘটিয়ে আমাদের যখন মুগ্ধ করে, তখন বুঝি গল্পের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে কবিতা। কল্পনা হলো কবিতার সম্রাজ্ঞী আর জাদু বাস্তবতা তার সন্তান— এরকমই মনে হয়। বাস্তবধর্মী গল্পেও রূপকথা যুক্ত হয়

গল্পেরই প্রয়োজনে, তেমনি কবিতায়ও। এই 'চিত্ররূপময়তা'-কে মনশ্চক্ষে দেখা ও দেখে আনন্দ পাওয়া যেন পাঠকের একটা বড় প্রাপ্তি। শ্রোতারা তাদের মুগ্ধতার কথা বলতে গিয়ে বলেন— কোনো কোনো গান বা কবিতা যখন তাদের চোখের সামনে ছবি হয়ে ভেসে ওঠে তখন যেন তা আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এমন বিষয়, যা কবিতার খুব বড় সম্পদ, অথচ তা নিয়ে আলোচনা হয় না, এই কারণেই খুব বেশি কথা চলে এলো।

কবিতায় ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প ও অন্যান্য যে সব গুণ কবিতাকে সমৃদ্ধ করে কবিতার আলোচনায় মাঝে মাঝে পাঠকের সামনে এসেছে বলে এই আলোচনায় সে সব আর টেনে আনা হয়নি। তবে এ কথা তো আমরা জানি যে পাঠকের কাব্যবোধ সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কাব্য সমালোচকদের একটা বড় ভূমিকা থাকে। অথচ দেখা যায় কবি কী বলেছেন তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, কিন্তু কবি কী ভাবে তা বলেছেন, সেই নির্মাণশিল্প বা শিল্পকলার দিক নিয়ে আলোচনা অনেক সময়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এভাবে শক্তিমান কবির নির্মাণ ও শিল্পকলার মুনশিয়ানা উপেক্ষিত হলে পাঠক ও সেই সঙ্গে কবিদেরও যেমন ক্ষতি, কবিতার অন্দরমহলের ঐশ্বর্য না-চেনায় তেমনি ক্ষতি হচ্ছে বাংলা কবিতারও। কারণ এর ফলে কবিতার একটি বড় সম্পদ আড়ালেই থেকে যায়, উন্মোচিত হয় না। 'কবিতার শিল্পকলা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি নিয়ে ভাবনা ও আলোচনা খুবই জরুরী ছিল, অথচ তা হয়নি। তা যদি হতো, তাহলে জটিল ও রহস্যময় কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশের চাবি পাঠক হাতে পেতেন। হয়তো তাহলে কবিতার অন্দরমহলের ঐশ্বর্য ও কবির মুনশিয়ানা থেকেই কবির উচ্চতা বোধগম্য হতো। কবি ও পাঠক নিশ্চয় একদিন এই সম্পদে সমৃদ্ধ হবেন। বাংলা কবিতার সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকবো আমরা।